তারিখ : 08 SEP 2016
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

দৈনিক আমাদের সময়

শহীদ ইকবাল

তরুণদের শিক্ষা ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ হলে চলবে না

দেশপ্রেম ও জাতিগঠনের কথা আমরা হরহামেশাই বলি। এর নতুন কোনো ব্যাখ্যা এখানে হাজির করার অবকাশ নেই। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ ও পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন এসেছে। তরুণরাই যখন জাতির শক্তি, দেশের উন্নয়নের কৃতী অংশীদার তখন তাদের বাদ দিয়ে তো কিছু চিন্তা করা যায় না। সেটি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক। ক'দিন আগে একটি যথার্থ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, 'আমাদের দেশের যুব সমাজ আজ নানাভাবে বিপথগামী হচ্ছে। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের দিকে তারা পা বাড়াচ্ছে। যুব সমাজকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দিকে সক্রিয় রাখতে পারলেই সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের ভয়াবহতা থেকে তাদের মুক্ত রাখা যাবে। এ ছাড়া খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যুব সমাজের মাঝে অধ্যবসায়, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্ম দেয়।' কথাগুলোর অন্তর্সত্য আছে একশ পার্সেন্ট। কথাগুলো যুগোপযোগী। আমাদের মনে হয়, দলমত নির্বিশেষে যে কোনো দায়িত্বশীল মানুষ এরকম কথা সমর্থন করবেন এবং উপলব্ধিতে নিতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না। রাজধানীতে ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেছেন। আমরা রাজধানী ছেড়ে গ্রাম-মফস্বলের দিকে এ মেসেজটি নিয়ে যেতে চাই। কারণ গ্রামগঞ্জে, উপজেলা পর্যায়ে এখন উঠতি তরুণদের অবস্থা তেমন সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকেন্দ্রীকরণের ধারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঠিক চোখেও পড়ে না। তথ্যপ্রযুক্তির হাওয়া লেগেছে সর্বত্র কিন্তু সেটি হজমের শক্তি আছে ক'জনার– সেটাই প্রশ্ন। স্কুল-কলেজ ও জেলা পর্যায়ের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে তরুণদের একটি বড় অংশ বেড়ে উঠছে। তাদের ক্রিয়াকর্ম ও ভবিষ্যৎ কী– তারা তো আশা ও স্বপ্নের মাঝামাঝি দ্বিধান্বিত দুলতে থাকে। সত্যিই কী এদের ভেতরে যে শক্তি আছে, যে চ্যালেঞ্জ আছে– সেটা আমাদের দেশ নিতে পারবে? কীভাবে? প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলো তাদের কাছে কে পৌঁছাবে বা কীভাবে সেটা তারা হৃদয়ে-মনে গ্রহণ করবে বা বাস্তবে সে অনুযায়ী চলবে! ব্যাপারগুলো যদি সত্যিই ঠিকঠাকমতো বা সঠিক পথে চলত তবে প্রজন্ম নিয়ে বুঝি তেমন ভাবতে হতো না। কিন্তু সংশয় হলো, অভিভাবকত্ব কে নেবে? প্রকৃত শিক্ষক কোথায়! স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার পেশাদারিত্ব এখন নিম্নগামী এটা অস্বীকার করবে কে! স্রেফ সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের যে পরিচর্যা দরকার সেটা কোথায় হচ্ছে?

২

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি নজরুল এমন এক বেপরোয়া, বাউন্ডেলে কবি ছিলেন যে, তিনি আমাদের সংস্কৃতির খোলনলচে পাল্টে দিয়েছিলেন। যে প্রয়োজনেরই হোক 'জয় বাংলা' বা অসাম্প্রদায়িক আদর্শ, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই কিংবা গাহি সাম্যের গান– এসব লিখেছিলেন। এ জন্য তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে 'বড় কবি' হতে পেরেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ শাসকের মুখের ওপর পদাঘাত করতেও ছাড়েননি। সত্য বলতে কোনো দ্বিধা ছিল না। কথাগুলো বলছি, বর্তমান প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে। তারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে, যুদ্ধাপরাধীর বিচার চায়, অন্যায় মানে না, সৎ ও সুশাসন চায়। সেটি খুব আকর্ষণীয় দিক। তাতে তাদের আবেগ ও যুক্তি দুটোই আছে। তার পরিচর্যাও একরকম আছে। জানারও আগ্রহ আছে। কিন্তু অভিভাবকত্বের সঠিক নির্দেশনা কী তারা পায়? উদ্দীপনার যে শক্তি তা পাওয়ারও তো উৎস লাগে। তা তো বেশ দুর্বল! ফলে এ বিশ্বাস ও আস্থা কেউ কেউ অর্জন করতে পারে, কেউ কেউ পারে না। বেশিরভাগই পারে না। এর বেশিরভাগ অংশটি মফস্বলের। এর কারণ কী? শিক্ষা কারিকুলামকে বিস্তৃতি দিতে গেলে এর পাশাপাশি অন্য কার্যক্রমও দরকার। সপ্তাহের একটি দিন খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কাটানো। বছরের বিশেষ দিনগুলোতে মনীষীদের নিয়ে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। মহাত্মা গান্ধী কে, উইনস্টন চার্চিল কে ছিলেন কিংবা এ দেশে রবীন্দ্র-নজরুল-বঙ্গবন্ধু কী কাজ করেছেন– তাদের ভালো-মন্দ সর্বরকম পর্যালোচনা জরুরি। কারণ কিশোরকালের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে সারাকাল চলার শক্তি জোগায়। এ শক্তিটুকু তো এখনকার প্রজন্ম পায় না। এখন জঙ্গিবিরোধী জনসচেতনতা চলছে। এই জনসচেতনতা কীভাবে কোমলমতি তরুণদের মনে স্থান পাবে! খেলাধুলা ও সাহিত্যচর্চার পরিবেশের স্থান কিংবা সে লক্ষ্যে অভিভাবকশীল আচরণ কীভাবে তৈরি হবে। এখন তো মনে হয় পরিবারের ভেতরের শিক্ষাটা নানাভাবে অগোছালো। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাঠামো ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে বাস্তবানুগ কিছু হচ্ছে না। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো অনেক পুরনো প্রতিষ্ঠান হলেও ট্রেনিং খুব একটা কাজে দিচ্ছে না। গতানুগতিক ও কনভেনশনাল ব্যবস্থাই সেখানে বহাল আছে। শিক্ষকদের বিএড বা এমএড ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কিন্তু তাদের ট্রেনিং কার্যক্রম যুগোপযোগী হয়নি। অনেকটা ইনক্রিমেন্ট বা ভাতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ হিসেবে তার গুরুত্ব। অনেক শিক্ষকেরই ট্রেনিং আছে কিন্তু শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োগ নেই। সত্যিকার অর্থে ট্রেনিংপূর্ব আর পরের মানসিকতারও কোনো বিশেষ পরিবর্তন আছে বলে মনে হয় না। ফলে সরকারের অর্থ খরচ হয়, কাঠামোও আছে কিন্তু ফল নেই। কিংবা ফল পেলেও তার সুফল এ প্রজন্ম তেমন পাচ্ছে না। বিষয়গুলো জেনারালাইজড মনে হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো তাই হচ্ছে।

৩

'ইনডিভিজুয়ালিটি' বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ফসল। এটি উনিশ শতকে আমাদের মধ্যে এসেছে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। ইতিবাচক অর্থেই বলা যায়। এক ধরনের প্রয়োজন ও ব্যবস্থাপনার তাগিদ তার মধ্যে ছিল। কার্যত সমাজের পরিবর্তনগুলোই অনেক রকম বাস্তবতা ঠিক করে দিয়েছিল। এই বাস্তবতারই প্রকাশ ছিল 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'। আধুনিকতার সঙ্গে এটা ঠিক কন্ট্রাডিকটরি বা স্ববিরোধী নয়। এর বহিঃপ্রকাশ ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি কিংবা সাতচল্লিশের পরে পূর্ববাংলার রাজনীতিতেও ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাবেও তার কিছুটা রেশ আমরা পেয়েছি। যদিও এ দেশে নগরায়ণ বা নাগরিক জীবনবোধ কোনোটিই সঠিক মাত্রায় আজও পূর্ণতা পায়নি। আর সে পরিস্থিতিও নেই। সমাজে সঠিকভাবে বুর্জোয়া বিকাশ না হলে এমনটাই হয়। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক নেতিবাচক স্বরূপ (ঠিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়) আমাদের সমাজে এখন প্রকট। মার্কসীয় তত্ত্বে বিচ্ছিন্নতা বা 'এলিয়েনেশন' নামক একটি কথা আছে, যা অর্থনীতি-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। সেটি অন্য প্রসঙ্গ। বলতে চাই ক্রমেই আলাদা হওয়ার একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এ সমাজে। যেখানে পারিবারিক বন্ধনগুলো হচ্ছে শিথিল। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে গতায়ু। আলাদা হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার দিকে ঝুঁকছে সবাই। সবকিছু পেরিয়ে নিজের প্রসিদ্ধি ও নিজের উন্নতিই যেন এখন মুখ্য। অন্যের যাত্রায় ভঙ্গ করলেও নিজের 'সাফল্য'টুকু চাই। এই আত্মমুগ্ধতা আর ব্যক্তি-উন্নতির প্রতিযোগিতা এখন অনেকদূর এগিয়েছে– যা আমাদের ভেতরের ঐক্য বিনষ্ট করছে। 'একতাই বল'– এ তত্ত্ব আর খাটছে না। একে তো নিজস্বতা বলা যায় না। স্বাতন্ত্র্যও নয়। এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। ফ্রেন্ডশিপ বা বন্ধুত্ব নির্বাসিত বলা যায়। শেয়ারিং নেই। আলাপ-আড্ডার বন্ধুরা দূরে সরে যায়। ফলে বিস্তর মানসিক চাপ ও একাকিত্বের জীবন উঠতি তরুণকে জীবন সম্পর্কে অন্য অর্থ তৈরির সুযোগ করে দিতে চায়। ফলে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ অন্যমাত্রা নিয়েছে। যে হৈচৈ মনকে প্রফুল্ল করে, সৃজনশীলতার প্রসার তা নেই। এ জন্য ধর্ম তাদের কাছে এক উগ্রতার অভিমুখ খুঁজে পেতে চায়। সহজেই সেদিকে প্ররোচনার সুযোগ তৈরি হয়। এই পরিবেশ থেকে বেরোনোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃত বক্তব্যটি অনুধাবন ও অনুসরণ করার যৌক্তিকতা সঙ্গত মনে হয়। আগেই বলেছি, এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর একার নয়। এটি সমা দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। সর্বস্তরের মানুষকে এ উপদেশই অনুসরণ করতে হবে। নইলে ব্যক্তি বা কারো জীবনই নিরাপদ হবে না। উদ্ধৃত করি প্লেটো : 'we can easily forgive a child who is af of the dark; the real tragedy of life is w men are afraid of the light' আমরা যদি অ দিকে যেতে ভয় পাই তবে সহজেই অন্ধকার গ্রাস ক প্রকৃত মানুষের পথটি কী? এই ইহজগতে প্রতি মানুষের অগ্রগমন কী? সভ্যতা ও আধুনিকতার স্র মানুষই– তবে মানুষের জ্ঞান ও আলোর নিশান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গো খুব প্রভাবশালী এবং মেধাবী ক্রিয়েটিভ রাজ ছিলেন। কিন্তু তার মেধা সভ্যতার বিনির্মাণে লাগেনি। এ কারণে তিনি নিজেই চরম হতাশাগ্র পড়েছিলেন। তার সন্তানদের সায়ানাইড দিয়ে নিজেও সস্ত্রীক মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে আত পথ বেছে নিয়েছিলেন। এটি এক ধরনের বিকার এসব উদাহরণ দেওয়ার কারণ, আমরা এ সম আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিকারগ্র শৃঙ্খলাহীন কিছু করে তুলতে চাই না। আলোর অ করতে চাই। প্রকৃত দেশপ্রেমিক পেতে চাই। ত ভয়কে অতিক্রম করতে হবে, সাহসী হয়ে জ উল্লাসে যুক্ত করতে হবে নিজেকে। তা না হলে অর্থহীন, মূল্যহীন। আর ধর্মীয় শিক্ষাও তাতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৪

এমনটা সত্য, শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলিত করে দেশপ্রে হওয়া যায় না। তবে প্রকৃত শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন শু বা শান্তিময় কিছু। বিশৃঙ্খল জীবন পরিশুদ্ধময় হতে না। খেলাধুলায় বা সংস্কৃতিচর্চায় শৃঙ্খলা আছে। শৃঙ্খলাই মানুষকে একত্রিত করে, মূল্যবোধ শেখ বন্ধনকে দৃঢ় করে। দেশকেও ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ কর আমরা দেশকে ভালবাসি। তাই তো ক্রিকেট টিমে সাফল্য কিংবা বিদেশে অন্য যে কোনো সাফল্যে আমাদে গর্বিত করে। এই গর্বিত জীবনের পথে তরুণদের ক্রিয়াশীল করে তোলা জরুরি। দেশ তো মায়ের মতোই– সে তার পরিচর্যা চায়, তার ভেতরের দৈন্য ঘোচাতে চায়– সে লক্ষ্যেই তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আর এ প্রজন্মকেই সে দায় নিতে হবে। সে জন্য অসুস্থতা নয়, ক্রিয়েটিভ কিছু করতে হবে। নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে সে কাজটা করা জরুরি। সবাই তা উপলব্ধি করুন। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ক সচেতনতার জন্য শিগগির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে অন্তত একদিন 'এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজ' বাধ্যতামূলক করুন। সেদিকে প্রশাসনিক নজরদারিও নিশ্চিত করা দরকার। আসলে যেটি দুঃখজনক তা হলো, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতীতে যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর চর্চা ছিল তা আবার কাঠখড় পুড়ে পুনরুদ্ধার করতে হচ্ছে, ফলে সামনে চলার পথটা আর সহজতর হয় না, বাধাগ্রস্ত হয়। তবে কী আমরা এভাবে হারাব আর তা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে আবার এক জায়গাতেই আটকে থাকব– এ তো কাজের কথা নয়!

লেখক : অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
shiqbal70@gmail.com